এখানে বড় কথা, লক্ষ্যে পৌঁছে সিদ্ধির কথা এখানে বলা হয়নি। কোন সাদৃশ্য নেই, তবুও 'জল দাও'-এর সঙ্গে শিশুতীর্থের কোথায় একটা সাদৃশ্যের কথা মনে আসে। এ যন্ত্রণা হয়তো আধুনিক যুগের। শিশুতীর্থের যাত্রীরা যেমন বিশ্বাস করেছিল মৃত নেতাকে, বিষ্ণু দে তেমনি বিশ্বাস করতে চেয়েছেন প্রেমের সঞ্জীবনী সুধায়:

তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমার ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমার ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে
জল দাও আমার শিকড়ে।

বিষ্ণু দে-র বহু কবিতায় প্রেম প্রিয়া সমাজ ও জীবন এক হয়ে গেছে। কখনো যে তিনি প্রেমের কথা বলেছেন এবং কখনো নতুন সমাজের কথা, বোঝা কঠিন। ভারতের বর্তমান স্বাধীনতা তাঁর অভিষ্ট নয়। তাই 'যুযুৎসুর খেদ' কবিতায় মহাভারতের ভীষ্মের ট্র্যাজেডির পুনরাবর্তন তিনি দেখেছেন গান্ধীজীর মধ্যে। তবু তাঁর মার্কস্‌বাদের ওপরে যে বলিষ্ঠ আশা ছিল সেই আশাই তাঁকে অস্তিবাদী করে তুলেছে।

অমিয় চক্রবর্তী

আধুনিক কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তীর কবিমানস অত্যন্ত জটিল এবং দ্বিধাদীর্ণ। আপাত-দৃষ্টিতে তাঁর কবিতাক্রে সহজবোধ্য মনে হতে পারে, কিন্তু তার আড়ালে লুকিয়ে আছে জটিল বিপ্রতীপ আধুনিক মনের সংশয়—যার একদিকে স্মৃতিদীর্ণ মৃন্ময়ী গৃহকোণের আশ্রয়, আর একদিকে আন্তর্জাতিক পরিবেশের নিরন্তর আকর্ষণ। দুটি ভিন্নমুখী ধারাকে কবি সমন্বয়সূত্রে এক করতে চেয়েছেন। বুদ্ধদেব-জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথের মতো তিনিও প্রথমে রবীন্দ্রানুসরণ করেছিলেন। তবে রবিদীপ্তির স্বর্ণাভা তাঁর কাব্য থেকে কোনদিনই মুছে যায়নি। অমিয় চক্রবর্তী কোনদিনই সচেতনভাবে রবীন্দ্র-বিরোধিতা করেননি। রবীন্দ্র-মানসিকতার সঙ্গে তাঁর আন্তরিক যোগ ছিল বলে তিনি সহজেই উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটি ধরতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্র-মানসিকতার মূলে যে অস্তিবাদী বিশ্বাস কাব্য-প্রেরণা জুগিয়েছে অমিয় চক্রবর্তীর মনে সে বিশ্বাস ছিল না, আধুনিক যুগের সংশয় নিয়ে তিনি বিশ্বরহস্যকে দেখেছেন। তাই তিনি রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত না হয়েও রবীন্দ্রানুসারী নন। শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবিদের অন্যতম উত্তরাধিকার-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁর যাত্রা শুরু হলেও, শেষ কথা তাঁর নিজের যাত্রিকতা। আধুনিক দ্বন্দ্বমুখর যুগেও অমিয় চক্রবর্তী সব সময় একটি সমন্বয়সূত্র বা সংগতি খুঁজতে চেয়েছেন, বিজ্ঞান তাঁর কাছে সেই সংগতির সূত্র। তাঁর মতো বিজ্ঞান-সচেতনতাও অন্যান্য কবিদের ছিল না। বিজ্ঞানের সঙ্গে কল্যাণের, প্রেমের সঙ্গে ধ্যানের সমন্বয়ে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান সম্ভব— এই বিশ্বাস তাঁকে কিছু পরিমাণ আধ্যাত্মিকও করেছে। পরম বিশ্বাসে তিনি বলেছেন:

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
এ ভাঙ্গা দরজাটা
মেলাবেন।...
তোমারই সৃষ্টি তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন। [সঙ্গতি]

বিজ্ঞান-চেতনাই অমিয় চক্রবর্তীকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বস্তুর সন্ধান দিয়েছে। রোমান্টিকতা পরিহার করে কবি যা কিছু চোখে দেখেছেন, তাকেই কাব্যে স্থান দিয়েছেন, একে তিনি নিজেই বলেছেন 'দৃষ্টির দর্শন':

চোখের সৃষ্টিকে দেখি ট্রেনের জানালা-কাঁচ দিয়ে
মধ্যাহ্নে আদিম অচেতন
মাটির বিস্তৃতি।
আমার হঠাৎ-হওয়া মন
আয়নায়
তারি পরে রূপ নিয়ে চলে যায়
উদাসীন ঘুরন্ত প্রকৃতি।...
এখন দিল্লীতে গাড়ি যাবে
সন্ধ্যা হয়ে সূর্য নাবে
মনে ভাবি দৃষ্টির দর্শন। [চলন্ত]

মন-আয়নায় প্রতিফলিত দৃশ্যাবলী নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের দান অমিয় চক্রবর্তী দেখেছেন বিজ্ঞান শুধু প্রজ্ঞাই বাড়ায়নি, দৃষ্টির সীমানাও বিস্তৃত করেছে:

চাঁপার কলিতে, কবি, ধরো অনুবীক্ষণ যন্ত্র।
খুলে যাবে কোমল দিগন্তে—দিগন্তে
জ্যামিতিক গড়নের অঙ্গন। সবুজের ঝাঁঝরিতে
আলো ঢোকে, কোষে কোষে, কচি-পাতা অনুপথে
হাওয়া খায়, চমকিত কুঁড়ি হয়। লেন্সের
হলদে বিন্দুতে ডোবো। খোঁজো জীবনাংশের
অনিদ্র প্রাণকণা। রসায়িত তেজ শোষে
গাছ-কল, ধাতুবেগ নানারঙা ধুরে আসে
অঙ্কের গণনায়। [পুষ্পদৃষ্টি]

বিজ্ঞানকে এমনভাবে কাব্যে ব্যবহার শুধু অভিনব নয়, অসামান্য।

আঙ্গিকের দিক থেকেও অমিয় চক্রবর্তী বৈজ্ঞানিক খণ্ডদৃষ্টির পরিচয়-দিয়েছেন, তার সঙ্গে মিশেছে ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রীর সমস্ত গুণ। টুকরো টুকরো, অসম্পূর্ণ, আপাত-অসংলগ্নতার মধ্যে একটি ভাবঘন চিত্র গড়ে ওঠে, জন্ম হয় নতুন রীতির কবিতার। কাব্যের ঝংকার ও গদ্যের ভঙ্গির মিশ্রণে তিনি কবিতাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন সেখানে সঙ্গীতের সংগতি ছাড়া আর কিছু পৌঁছতে পারে না। হপকিন্স ও রিল্‌কের অন্তর্দ্বন্দ্ব অমিয় চক্রবর্তীতে বর্তমান। বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁকে যেমন বর্তমান-সচেতন করেছে, তেমনি ছিন্নমূল মানুষের বেদনাবহ ইতিহাস তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দিয়েছে। তাঁর কবিতার পটভূমি চারটি মহাদেশে প্রসৃত। বিশ্ব-নাগরিকতা তাঁর মনে, নতুন বিশ্বাস নিয়ে এসেছে, কিন্তু আলোচ্য কালসীমায় এ পর্যায় যথেষ্ট নয়। শুধু দেখি 'দূরযানী'-তে জীবনরসিক কবি বাস্তবের মধ্যেই গভীর আশা ও বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। দুঃখের মধ্যে অসঙ্গতির মধ্যে তিনি দেখা আর না-দেখা জগৎকে, ইন্দ্রিয় ও মনকে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন:

জলের ছাপ, বাথার তান, বন-গাথার
—তারি তো দান।

রঙীন তাপ, ব্যথার দান, ব্যাকুল প্রাণ,
মনের মান, মনের তাপ, ব্যথার ভান
—নিয়েছে সে-ই।
কিছু নেই, কিছু নেই। [মধুর নির্বাণ]

আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের সফলতার মূলে এই পাঁচজনের অবদানকেই যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, তার কারণ আধুনিক যুগ-স্বরূপ এই পাঁচজনের কবিতায় সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত। রবীন্দ্র-ধারার নিশ্চিন্ত ছত্রছায়ায় বসে আরামের নিঃশ্বাস না নিয়ে এঁরা সুকঠোর সাধনার বাধা-সঙ্কুল পথে এগিয়ে গেছেন বাংলা কবিতার জন্যে নতুন পথ কেটে দিতে। সযত্ন ও সচেতন-প্রয়াসে আধুনিকতার সঠিক লক্ষণকে এঁরা গ্রহণ করেছেন গভীর মননের দীপ্তিতে। নূতন কথা নূতন করে বলার জন্যে এঁদের সারাজীবনের সাধনা যদি না থাকত, এত অল্প-সময়ের মধ্যে আধুনিক কবিতা চরম সাফল্য অর্জন করতে পারত না। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এঁরা দুটি সমস্যায় পড়েছিলেন। প্রথমত, রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্তির সমস্যা; দ্বিতীয়ত, উত্তরাধিকার সূত্রে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করার সমস্যা। দুটি সমস্যাই এঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে সমাধান করেছেন, অন্যান্যদের এই অসুবিধের ততখানি সম্মুখীন হতে হয়নি। এঁদের সঙ্গে যাত্রা শুরু করেও পরে যারা পিছিয়ে পড়েছিলেন বা বলা যায় ভিন্ন লক্ষ নিয়ে পথ-পরিবর্তন করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ও অজিত দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র বুদ্ধদেবের সঙ্গে প্রথম থেকে আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কল্লোল-কালিকলমের পৃষ্ঠায় তাঁর আধুনিক মননের স্বাক্ষর আছে, তবে তিনি গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে খ্যাতি অর্জন করেছেন, কবিতার ক্ষেত্রে তাঁকে ততটা 'আধুনিক' বলে মনে হয়নি। অথচ 'কল্লোলে'র যুগে আধুনিক কবি রূপেই তিনি পরিচিত হন। তিনি প্রথম থেকেই জীবনের কুৎসিত-নিষ্ঠুর দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মানব-আত্মার মহতী বিনষ্টি লক্ষ করেছেন, কিন্তু সেই যন্ত্রণাময় পরিস্থিতির হাত থেকে সত্যিই মুক্তি পাওয়া সম্ভব কিনা, সেকথা চিন্তা করেননি। তিনি এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিদ্রোহ করেছেন, নজরুল যেমন বিদ্রোহ করেছিলেন তেমনিভাবে। কিন্তু আধুনিক মানুষের দ্বিধাদীর্ণ মনের যন্ত্রণা শুধু দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে জড়িত কিনা সে বিষয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র কোন অনুসন্ধান করেননি, সেজন্য তাঁর কাব্যে জটিল-গ্রন্থিলতা অনুপস্থিত। অবশ্য নগর-সভ্যতার যান্ত্রিকতা থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রও মুক্তি চেয়েছেন, মুক্তির জন্য তাঁর পিপাসা মিটেছে—ভৌগোলিক অনুসন্ধানে। জীবনানন্দ তাঁর কাব্যবিচার করে বলেছেন: "প্রেমেন্দ্র সমুদ্র-প্রেমিক নাবিকের মতো—অতিবেল তরঙ্গের উপর দিয়ে ভূগোল ও মানুষের ইতিহাস, ও পৃথিবীর আকাশ চিনে, আলো চিনে, রৌদ্র পটবেলাভূমি সহসা লক্ষ করে আবার হারিয়ে ফেলে—এ জীবনকে সময়ের কাছে ঋণী রেখে নিরন্তর সময় কাটিয়ে চলেছেন। কিন্তু এ ঋণাত্মক সময়-ব্যবহার কি অগ্রসর না গোলক ধাঁধায় ঘোরা, না শঙ্খরেখার ঘূরুনিতে ছন্নাংশ উন্নতির লোভে আবিষ্ট হয়ে তাকে শুভ পরিণামের যাত্রা বলে মনে করা—প্রেমেনের কবিতা শেষ পর্যন্ত এ সবের কোনো সম্যক পরিচয় দিচ্ছে না।"

এই উক্তির আলোকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি খুঁজে নেওয়া যায়। এ'সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানবদরদী মন ও জনসাধারণের কবি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আধুনিক কাব্য আন্দোলনের সময় একটি নতুন সুর শুনিয়েছিল, নজরুলের মতো তিনিও খেটে-খাওয়া

মানুষদের জন্য কবিতা লিখলেন। অভিজ্ঞতা না থাকলেও সমবেদনা সে অভাবটুকু পুষিয়ে দিয়েছে। যেমন—

আমি কবি যত কামারের, আর কাঁসারির, আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
আমি কবি যত ইতরের।

পুনরায়,

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগ্যদের বন্দরটিতে ভাই
সেই সব যত ভাঙা জাহাজের ভীড়!
শিরদাঁড়া যার বেঁকে গেল
আর দড়াদড়ি গেল ছিঁড়ে
কব্জা ও কল বেগড়ালো অবশেষে,
—তাদের নোঙর নামাবার ঠাঁই
দুনিয়ার কিনারায়,
—যত হতভাগ্য অসমর্থের নির্বাসিত নীড়। [বেনামী বন্দর]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্রের মতো তিনিও ছিলেন কল্লোলের "আধুনিকোত্তম" লেখক। নূতন লেখক-রূপে নতুন সাহিত্য-সৃষ্টির বাসনা নিয়ে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে দূরে যাওয়ার কঠোর সংকল্প ফুটে উঠল তাঁর 'আবিষ্কার' কবিতায়। এই প্রথম প্রকাশ্য রবীন্দ্র-বিদ্রোহ দেখা গেল। অচিন্ত্যকুমার লিখলেন :

এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহংকার,
যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে ও লেখনী
কারেও না ডরি কভু, সুকঠোর হউক সংসার,
বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি।
পশ্চাতে শত্রুর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে, পথ কবি, রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব মে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে।"

অবশ্য অচিন্ত্যকুমারের নিজের কবিতায় এ বিদ্রোহ সার্থক হয়নি, রবীন্দ্র-প্রতিরোধের অস্ত্রটি নিক্ষেপ করে তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন রবীন্দ্রানুগতো। পরবর্তী সময়ে লেখা 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটি তার প্রমাণ :

আমি তো ছিলাম ঘুমে;
তুমি মোর শির চুমে
গুঞ্জরিলে কী উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে-কানে
চলো রে অলস কবি
ডেকেছে মধ্যাহ্ন-রবি
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।
তুমি ছাড়া কে পারিতো
মরণের মহাকাশে মহেন্দ্রের মন্দির সন্ধানে।

অজিত দত্ত

আধুনিকদের মধ্যে অজিত দত্ত ও অন্নদাশংকর রায়কে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন যথার্থ হাল্কা কবিতালেখক। বিষ্ণু দে-ও এই দলে ছিলেন। কিন্তু সাম্যবাদের প্রেরণা তাঁকে ভিন্ন পথে নিয়ে গেছে। কবিতার ক্ষেত্রে অজিত দত্ত ও অন্নদাশংকরের মন কৌতুকের রাজ্যে স্বচ্ছন্দে বিহার করে। অজিত দত্ত বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে একত্রে 'প্রগতি' প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে মনন বা আঙ্গিকের দিক থেকে নতুন কিছু দিতে পারেননি। প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্ত যেমন বিদ্রোহ জানাতে গিয়ে নতুন পথ না নিয়ে নজরুলের অনুবর্তন করেছিলেন, অজিত দত্ত তেমনি অনুসরণ করতে চেয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ সেনকে। তাঁর কাব্য-নায়িকা 'মালতী' রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর বিপরীত। অর্থাৎ বিশ্ব তাকে কামনা করছে কিনা সেটা বড়ো নয়, মালতী স্বয়ং বিশ্বকে কামনা করে—

সৌন্দর্য কামনা যার তারি তরে রূপসী মালতী
আপনার দেহে গেহে সব রূপ করেছে আহ্বান....
রূপসী মালতী আজ আপনারে করিবে প্রদান
রূপহীন পুরুষেরে, আজ রাত্রে তথাপি তথাপি
ধরণীর শ্রেষ্ঠ রূপ ব্যর্থতায় নাহি হবে ম্লান। [মালতী]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লেখা হালকা, ছাঁদের কবিতায় অজিত দত্ত আরো স্বচ্ছন্দ—

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যাস ?
নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে
চলেও কাঁকর আধাআধি থাকে হে।

অন্নদাশংকর রায়

অন্নদাশংকর যত ভালো গদ্য-শিল্পী তত বড়ো কবি নন কিন্তু বয়স্ক-পাঠ্য ছড়া রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য—

"মনের কথা মনের মতো করে
কইবো আমার মনের মতনকে
কবি হবার নেই দুরাশা ওরে
সার মেনেছি সত্য কথনকে।"

পরবর্তী পর্যায়

আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ের সফলতার পরে অন্ত্য-কল্লোল যুগে যে তিনজন শক্তিশালী কবি আধুনিক কবিতা লিখেছিলেন তাঁরা হলেন সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য। কালের দিক দিয়ে এঁরা পরবর্তী পর্যায়ের কবি। রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ প্রতিভাকে উত্তীর্ণ হবার জন্যে এঁদের কোন চেষ্টা করতে হয়নি। কারণ, ইতিপূর্বের পাঁচজন কবি নানাভাবে তাঁকে কিংবা বলা যায় তাঁর প্রভাবকে অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন। কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল হিসেবে অবশ্য সমর সেন এবং অমিয় চক্রবর্তী সমকালীন কবি।

সমর সেনের কয়েকটি কবিতা এবং অমিয় চক্রবর্তী 'খসড়া'র প্রকাশকাল ১৯৩৭/৩৮ সাল। তবে অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যসাধনা শুরু হয় অনেক আগে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য তিনজনেই সাম্যবাদী; বিষ্ণু দের মতোই একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী। তবুও এঁদের বৈশিষ্ট্য নতুন নতুন দিকদর্শনে।

সমর সেন অতি সচেতন নাগরিক কবি। বর্তমান যুগের অসুস্থ রুগ্ন আবহাওয়াকে তিনিই গদ্যছন্দে কবিতার রূপ দিলেন। ছন্দের দোলা যা কানে মনে অমোঘভাবে ধরা পড়ে সমর সেনের কবিতায় তার বিন্দুমাত্র আভাস নেই; গদ্য-ছন্দের পূর্বতন কবিদের অতিবর্তন করে সমর সেন এভাবেই একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। নগর কলকাতার অসুস্থ পরিবেশ এই ছন্দে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে ঃ

আকাশে ধোঁয়ার ক্লেশ, চারদিকে ধোঁয়ার গন্ধ,
আর হাওয়ার অসংখ্য ধূলোর কণা
জীবন্ত বীজাণুর মতো।

সমর সেনের কবিতায় যৌবন উন্মেষিত হচ্ছে বিকৃত অসুস্থ পরিবেশে। মানুষের দেহমনের সহজ স্ফূর্তি যে পরিবেশে ব্যাহত হয় শহরের সেই বিকারগ্রস্ত যৌনতার ছবি উদ্ঘাটিত হয়েছে। কবি এই কদর্য রুগ্ন অসহায় পরিবেশের জন্য দায়ী করেছেন সামাজিক দুর্ব্যবস্থাকে। বণিক-শক্তির ব্যভিচারী প্রতাপ মানবজীবনের ভারসাম্যকে ক্রমাগত নষ্ট করে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সাঁওতাল পরগণা দূর-স্বপ্ন নিয়ে এসেছে, মহুয়ার গন্ধ বয়ে এনেছে নবযৌবনের বিষম মধুর দীর্ঘশ্বাস ঃ

আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া ফুল
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

সমর সেন অনুভব করেছেন জীবনে এই সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার জন্যই শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজন। মহাযুদ্ধের দুঃস্বপ্ন কবিকে আরোই বিপ্লবপন্থী করে তুলেছিল। রাজনৈতিক দলের প্রচার-পুস্তিকার মতোই সমর সেন লিখলেন—

রক্ত-আশ্বিনে রুশ বিপ্লবের পর
মধ্য ইউরোপে
জারজ সন্তানকে সন্দোপন বসদ জোগায়
মাতা তার, দাঁতচাপা বৃদ্ধা গণিকা।
পশ্চিমী গণতন্ত্র নাম।" [নানাকথা]

অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতো সমর সেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, রবীন্দ্রপ্রভাব নিয়ে কোন চিন্তা করেননি, এমনকি রবীন্দ্রনাথের ক্ষীণতম প্রভাবেও তিনি প্রভাবিত হননি। হয়তো সেজন্য উত্তরাধিকার সূত্রে রবীন্দ্রনাথকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছেন। সুধীন্দ্র দত্ত এবং বিষ্ণু দে-র মতো তিনিও রবীন্দ্রকবিতার চরণ নিজের কবিতায় ব্যবহার করেছেন মাত্র কয়েকটি পংক্তিতে—

গুরুদেব জানতেন কবি অমৃতের দূত।
তাই তাঁর নাট্যে সংকট সময়ে হঠাৎ অদ্ভুত
বহুরূপী ঠাকুর্দাকে দেখি, কিম্বা কবিকে।
আধ্যাত্মিক মুস্কিল আসান তারা করে।
তার পরে জল পড়ে ও পাতা নড়ে। তারপর
সত্য শিব ও সুন্দর।